পাঠকের মতামত

ভোটের জন্যই যুদ্ধ-জিগির

কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ৪০ জন সি আর পি এফ জওয়ান জঙ্গি হামলায় নিহত হওয়ার খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পর থেকেই গোটা দেশ জুড়ে একটা যুদ্ধোন্মাদনা চাগিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। কি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা প্রিন্ট মিডিয়া, সবেতেই একটা আলোচনা 'এই যুদ্ধ লাগল বলে'! আর সীমান্তে যুদ্ধের উত্তাপ ছড়াক বা না ছড়াক তার চেয়ে বেশি 'যুদ্ধং দেহি' উত্তাপ সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতে। ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস অ্যাপ— সর্বত্র অন্ধ পাকিস্তান বিরোধী প্রচার।

উল্টো ছবিও আছে। প্রশ্ন উঠছে, যে দেশের প্রধানমন্ত্রী '৫৬ ইঞ্চি ছাতি' ফুলিয়ে 'তাল ঠোকেন' সেই প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর উপর হামলা হতে পারে এমন সতর্কতামূলক খবর থাকা সত্ত্বেও আগাম কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না কেন? যারা দেশের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত এবং প্রত্যেক বছর যাদের উন্নয়নের কথা বলে সরকার মোট বাজেটের বৃহৎ অংশ ব্যয় করে, তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারের এতটুকু হেলদোল নেই কেন? যে রাস্তা দিয়ে সেদিন সেনা গিয়েছিল তা নাকি নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর অঞ্চল! সেই রকম একটি অঞ্চলে ৩৫০ কেজি আর ডি এক্স নিয়ে একটি গাড়ি নিরাপত্তার বেড়াজাল টপকে ঢুকে পড়ল কীভাবে? আর এই প্রশ্নগুলি তুললেই তাদের দেশদ্রোহী বলা হচ্ছে কোন যুক্তিতে?

পুলওয়ামার ঘটনার ১২ দিন পরে দেশের বিমানবাহিনী ১২টি মিগ-২১ যুদ্ধ বিমান সহযোগে পাকিস্তানের বালাকোটে হামলা চালাল। ভারতীয় মিডিয়া এক নাগাড়ে প্রচার করে গেল, 'ভারতীয় বিমান বাহিনীর হামলায় ৩৫০ জন জঙ্গি খতম হয়েছে'। কিন্তু তার স্বপক্ষে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সরকারের তরফে পেশ করা হল না।

আন্তর্জাতিক মিডিয়া ভারতীয় মিডিয়ার দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল যে ভারতীয় বিমানবাহিনীর হামলায় ক্ষতি হয়েছে ১৫টা পাইন গাছ, আর মরেছে ১টি মাত্র কাক! তখন সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা নিজেদের মুখ ঢাকতে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য শুরু করে দিলেন। তা হলে সত্য কোনটা? প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষকে সত্য বলছেন না কেন? দেশের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। পাঁচ বছর পূর্বে প্রতিশ্রুতির যে ডালা সাজিয়ে সরকারি ক্ষমতায় বসেছিল বর্তমান শাসকদল তা পুরোটাই যে 'ভাঁওতা' তা এখন জলের মতো পরিষ্কার। ফলে সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা যখন নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের দুয়ারে ভোট ভিক্ষে করতে যাবেন এখন তো তাদেরকে জনগণের 'তেতো বড়ি' মার্কা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। ফলে সেটা যাতে না ঘটে তার জন্যই কি যুদ্ধ যুদ্ধ জিগির তোলা?

সৌপ্তিক পাল

কলকাতা

আলু চাষিদের সাথে সরকারি প্রতারণা চলছেই

বিষের শিশি হাতে নিয়ে রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখালেন পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের আলু চাষিরা। ফসলের দাম না পাওয়া ও দুর্যোগের কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মেদিনীপুর-চন্দ্রকোনা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। হুগলির চাষিরাও বিক্ষোভে সামিল।

দেশজুড়ে চাষিরা যে চূড়ান্ত সংকটের সম্মুখীন তা কারও অজানা নয়। ফসলের দাম না পেয়ে ঋণগ্রস্ত চাষিদের আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার খবর প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে।

চলতি বছরে এ রাজ্যে আলুচাষিরা ইতিমধ্যেই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ভাল ফলন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে। এ বছর যে আলুর ফলন ভাল হবে তা জানাই ছিল। গত বছর এ রাজ্যে আলুর ফলন হয়েছিল ১ কোটি মেট্রিক টন, যা এ বছর বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়াবে বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞরা।

রাজ্য সরকার মোট উৎপাদিত আলুর ১৫ শতাংশ অর্থাৎ ১০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু চাষিদের কাছ থেকে কিনবে বলে জানিয়েছে। কুইন্টাল প্রতি ৫৫০ টাকা অর্থাৎ ৫.৫০ টাকা কেজি দরে চাষিরা সরকারকে আলু বিক্রি করতে পারবে। বাকি ১ কোটি ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন আলুর ভবিষ্যৎ কী? আলু নিয়ে ফি-বছরের ন্যায় চাষিকে গ্রামীণ ফড়ে, আড়তদারদের শরণাপন্ন হতে হবে যেখানে কেজি প্রতি ১-২ টাকার বেশি দাম চাষির পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। আবার একজন চাষি সরাসরি সরকারের কাছে সর্বাধিক ২৫ কুইন্টাল আলু বিক্রি করতে পারবে। কোন কোন চাষির কাছ থেকে আলু কেনা হবে তা তার নাম আলু চাষি হিসাবে নথিভুক্ত রয়েছে কি না, তা দেখে বিডিও ঠিক করবেন। অভিজ্ঞতা বলে, এই তালিকা তৈরির ক্ষেত্রেও চলবে ব্যাপক দলবাজি, দুর্নীতি। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বা ঋণগ্রস্ত চাষি সরকারি মূল্যে আলু বিক্রি করার সুযোগ পাবেন না। যাঁরাও সুযোগ পাবেন, তাঁদের শুধু নাম থাকলে হবে না— বিডিও-তে গিয়ে আগে জমির কাগজ, সচিত্র পরিচয়পত্র, কিষান ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে সরকারি চিরকুট সংগ্রহ করতে হবে। এই চিরকুট নিয়ে জমি থেকে আলু তুলে ৮ মার্চ থেকে ২২ মার্চের মধ্যে আলু নিয়ে হিমঘরে পৌঁছতে পারলে, তবেই সর্বোচ্চ ২৫ কুইন্টাল আলু বিক্রি করে ১৩, ৭৫০ টাকা পাওয়ার যোগ্যতা চাষি অর্জন করতে পারবেন। বোঝাই যাচ্ছে এই নিয়মে ভাগচাষি বা প্রান্তিক চাষিদের কোনও সুবিধা হবে না। অথচ এ রাজ্যে যে লক্ষ লক্ষ ভাগচাষি বা প্রান্তিক চাষিরা রয়েছেন, যাদের কাছে সরকারি ঋণের সুযোগ সহজে পৌঁছয় না। যাঁদের বেশি দামে সার-বীজ বা সেচের ব্যবস্থা করতে হয়, যাঁরা গ্রামীণ মহাজন-সুদখোরদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করতে বাধ্য হন, যাঁরা সর্বাধিক সমস্যার মধ্যে পড়েন, তাঁদের সরাসরি আলু বিক্রি করার সুযোগ নেই। আবার যে চাষিদের পক্ষে দাঁড়িয়ে সরকার ৫.৫০ টাকা কেজি দরে আলু কিনছে তাঁরাও সর্বোচ্চ ১৩,৭৫০ টাকার বেশি সরকারের কাছ থেকে পাবেন না। বাকি আলু আড়তদারদের কাছে বিক্রি করতে হবে জলের দরেই। যার মধ্য দিয়ে চাষের খরচও ওঠা সম্ভব নয়।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে বেশি করে আলু খাওয়ার নিদান দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই আহ্বান কি অভাবগ্রস্ত চাষিকে বাজার ধরাতে পারবে? চাষিকে কি বাঁচানো যাবে? না, টোটকা, হেকিমি করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আসলে দেশের কৃষি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয়টি কেন্দ্রের বা এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার এড়িয়ে যেতে চাইছে। যা করলে চাষি বাঁচবে, সেই পদক্ষেপ না করে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারই ভোটের দিকে তাকিয়ে কৃষি বাজেট তৈরি করেছে। ফুটো পাত্রে জল ঢালার মতো, ফোঁপরা বরাদ্দ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে চলছে রাজনৈতিক তরজা। যখন প্রধানমন্ত্রী বলছেন, চাষির রোজগার দ্বিগুণ করবই, তখন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তিনগুণ করেই দিয়েছি। অথচ আমরা জানি, চাষির পাশে দাঁড়াতে রাজ্য যত রকম বরাদ্দ করেছে, (আগাম অনুদান, পেনশন, চাষির মৃত্যুতে অনুদান, ফসল বিমার প্রিমিয়াম এবং কৃষি দফতরের প্রশাসনিক খরচ) সব মিলে দাঁড়ায় মোট কৃষি বাজেটের তিন ভাগের দুই ভাগ। এক ভাগ থাকে চাষির রোজগার বাড়ানোর জন্য।

সরকার প্রচার করছে, 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান চাষের খরচ কমাবে এবং রোজগার বাড়াবে। কিন্তু রোজগার বাড়ার বিষয়টি তো নির্ভর করে চাষির সব ফসল ঠিকমতো উঠল কি না বা চাষি সব ফসলের ঠিকমতো দাম পেল কি না তার উপরে। দুটোই তো অনিশ্চিত— প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্টও হতে পারে বা সব ফসল সহায়ক মূল্যে বিক্রি নাও হতে পারে। চাষিকে বাজার ধরাতে গেলে প্রয়োজন চাষির সমস্ত ফসল সরকারের পক্ষ থেকে লাভজনক দামে কিনে নেওয়া এবং পুনরায় ন্যায্য দামে জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া, অর্থাৎ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা। এই দাবি বহুবার এসইউসিআই(সি) দলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত করা হলেও কোনও সরকারই তাতে কর্ণপাত করেনি।

বর্তমানে বাজেটে পরিকাঠামো তৈরিতে কোনও বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি। ভাল চাষের জন্য লাগে ভাল বীজ ও ভাল মাটি। নতুন বীজ তৈরি করা ও তার উপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থা তৈরি করা, যাতে সকল চাষি পরীক্ষিত ও শোধিত বীজ পায় এবং মাটির পরীক্ষা ও চাষিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রভৃতির জন্য যে বরাদ্দ দরকার ছিল তা বাজেটে নেই। কৃষি দফতরের অসংখ্য পদ শূন্য, যেখানে নতুন কোনও নিয়োগও হচ্ছে না, — এই প্রশ্নেও সরকার উদাসীন।

এ রাজ্যে একসময় ব্লকে ব্লকে কিষান মান্ডি, রাজ্য জুড়ে প্রচুর গুদাম ঘর তৈরি, বেশি চাহিদার ফসল ফলানোর ট্রেনিং দেওয়া প্রভৃতির যে ঘোষণা হয়েছিল তা প্রায় অপূরিতই থেকে গেছে। এক সময়ে মোদি সরকার, 'রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা' ঘোষণা করেছিল, শোধিত মাটি, উন্নত বীজ, খামার, ক্ষুদ্র সেচ ইত্যাদি পরিকাঠামোর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বলেছিল এতে গরিব চাষির রোজগার বাড়বে।

ক্রমে করপোরেট পুঁজির ত্রাণে বিজেপি সরকারের তাগিদ যত বৃদ্ধি পেয়েছে তত কমেছে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ। এর মধ্যেও যতটুকু অনুদান পাওয়া যায় তা নিয়েই কেন্দ্র-রাজ্য তরজা। রাজ্যের চাষিরা চূড়ান্ত প্রতারণা ও বঞ্চনার শিকার। কৃষির উন্নয়ন ও উপযুক্ত কৃষি পরিকাঠামো গড়ে তোলার কোনও পদক্ষেপ সরকারগুলির নেই। চাষিও ভুলতে বসেছে তার অধিকারের বিষয়টি। চাষি যদি ফসলের ন্যায্য দাম না পায়, চাষির রোজগার যদি না বাড়ে, শুধু বছরে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে বা মাত্র ১০ . লক্ষ মেট্রিক টন আলু কিনে বা 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্প চালু করে চাষিকে সংকট থেকে বাঁচানো যাবে না।

আশাকর্মীদের ডেপুটেশন

১লা মার্চ পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন ডায়মন্ডহারবার সি এম ও এইচ নিকট এক ডেপুটেশন দেয়। আশাকর্মীদের তিন মাস বকেয়া স্থায়ী ভাতা ও ফরম্যাট এর পারিশ্রমিক অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া,আশাকর্মীদের উপর প্রকল্প বহির্ভূত কাজ চাপানো বন্ধকরা,ফরম্যাট বাতিল করে মাসিক উপযুক্ত বেতন চালু করা,সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ডি এ,টি এ বোনাস,পি এফ,পেনশন চালু করা সহ ১২ দফা দাবিতেই ছিল এই ডেপুটেশন। সাহানারা বেগম এবং শুভ্রা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ৮ জনের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি জমা দেয়। সি এম ও এইচ বকেয়া টাকা শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

রাজ্যের ৪২টি আসনেই
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এস ইউ সি আই (সি)

১. কোচবিহার	প্রভাত রায়
২. আলিপুরদুয়ার	রবিচন রাভা
৩. জলপাইগুড়ি	হরিভক্ত সরদার
৪. দার্জিলিং	তন্ময় দত্ত
৫. রায়গঞ্জ	সুজনকৃষ্ণ পাল
৬. বালুরঘাট	(ঘোষিত হবে)
৭. মালদা উত্তর	সুভাষ সরকার
৮. মালদা দক্ষিণ	অংশুধর মণ্ডল
৯. জঙ্গিপুর	সামিরুদ্দিন
১০. বহরমপুর	আনিসুল আম্বিয়া
১১. মুর্শিদাবাদ	বকুল খন্দকার
১২. কৃষ্ণনগর	সেখ খোদাবক্স
১৩. রানাঘাট	পরেশচন্দ্র হালদার
১৪. বনগাঁ	স্বপন মণ্ডল
১৫. ব্যারাকপুর	প্রদীপ চৌধুরী
১৬. দমদম	তরুণ দাস
১৭. বারাসাত	তুষার ঘোষ
১৮. বসিরহাট	অজয় বাইন
১৯. জয়নগর	জয়কৃষ্ণ হালদার
২০. মথুরাপুর	পূর্ণচন্দ্র নাইয়া
২১. ডায়মন্ডহারবার	অজয় ঘোষ
২২. যাদবপুর	সুজাতা ব্যানার্জী
২৩. কলকাতা দক্ষিণ	দেবব্রত বেরা
২৪. কলকাতা উত্তর	বিজ্ঞান বেরা
২৫. হাওড়া	শানওয়াজ
২৬. উলুবেড়িয়া	মিনতি সরকার
২৭. শ্রীরামপুর	প্রদ্যোৎ চৌধুরী
২৮. হুগলি	ভাস্কর ঘোষ
২৯. আরামবাগ	প্রশান্ত মালি
৩০. তমলুক	মধুসূদন বেরা
৩১. কাঁথি	মানস প্রধান
৩২. ঘাটাল	দীনেশ মেইকাপ
৩৩. ঝাড়গ্রাম	সুশীল মাণ্ডি
৩৪. মেদিনীপুর	তুষার জানা
৩৫. পুরুলিয়া	রঙ্গলাল কুমার
৩৬. বাঁকুড়া	তন্ময় মণ্ডল
৩৭. বিষ্ণুপুর	অজিত বাউরি
৩৮. বর্ধমান পূর্ব	নির্মল মাঝি
৩৯. বর্ধমান-দুর্গাপুর	সুচেতা কুণ্ডু
৪০. আসানসোল	অমর চৌধুরী
৪১. বোলপুর	বিজয় দলুই
৪২. বীরভূম	আয়েষা খাতুন

এসইউসিআই(সি) বাম ঐক্য চায় সংকীর্ণ নির্বাচনী স্বার্থে নয়, গণআন্দোলনের প্রয়োজনে

মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (ইউনাইটেড)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি কেরালার এর্নাকুলামে তাদের চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষকে অনুরোধ করেছিল। তাতে সাড়া দিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান। ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি বক্তব্য রাখেন। ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই(এমএল) রেড ফ্ল্যাগ, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন, আরএমপি ইত্যাদি দলের নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন।

কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ বলেন, এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষ থেকে আমি এম সি পি আই (ইউ)-এর পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছি। আপনাদের কংগ্রেস ও সমস্ত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন আমি বহন করে এনেছি। আমি আশা করি, আমাদের সাধারণ শত্রু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক দল এবং শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে এই কংগ্রেস আরও জোরদার করবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্ব জুড়ে কী ধরনের দস্যুবৃত্তি চালাচ্ছে, সে বিষয়ে আমরা বামপন্থীরা সচেতন। দুনিয়ার মেহনতি মানুষের উপর তারা সীমাহীন শোষণ-পীড়ন করে চলেছে। সাম্প্রতিক অতীতে তারা ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, লিবিয়ার মতো বহু দেশে হানাদারি চালিয়ে নিজেদের কব্জায় এনেছে। এখন ভেনেজুয়েলার দিকে তাদের শ্যেন দৃষ্টি। এই অবস্থাতেও পুঁজিবাদী শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে ইউরোপ ও আমেরিকায় একের পর এক আন্দোলন গড়ে উঠছে, কিন্তু সঠিক নেতৃত্বের অভাবে সেগুলি সফল হতে পারছে না।

ভারতেও শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির অনুসৃত নীতির দৌলতে বিশেষ করে উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে হাতে গোনা কিছু একচেটিয়া পুঁজিপতি বিপুল সম্পদের মালিক হচ্ছে, পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষ সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন। বেকারত্বের হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আমরা বামপন্থী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ নই বলে প্রতিবাদ আন্দোলন দুর্বল। তাই সহজেই এ সব ঘটতে পারছে। মেহনতি মানুষের মহান শিক্ষক কমরেড লেনিন এ বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশ করে বলেছেন, নিজেদের মধ্যে যতই মতবিরোধ থাকুক, সর্বসম্মত ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেছেন, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি বামপন্থীদের উচিত নিজেদের মতপার্থক্যের

বক্তব্য রাখছেন কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ

বিষয়গুলিকে সর্বসমক্ষে আলোচনার জন্য তুলে ধরা। যাতে শুধু শ্রমজীবী মানুষই নয়, বামপন্থী দলের কর্মীরাও এ থেকে শিক্ষা নিতে ও সচেতন হতে পারেন। ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যের নীতি এবং আচরণবিধির ভিত্তিতে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচালিত হওয়া উচিত। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়েই সঠিক রাজনৈতিক লাইন বেরিয়ে আসবে এবং জয়যুক্ত হবে।

১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার সময়ের কিছু অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে কমরেড রাধাকৃষ্ণ বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হয়েছিল, এসইউসিআই(সি) তার শরিক ছিল। বিভিন্ন রাজ্যে তখন জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে আন্দোলন ('জে পি মুভমেন্ট') শুরু হলে সর্বত্রই আমরা সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। সেই আন্দোলনে সিপিএম-সিপিআইকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জয়প্রকাশজি বারংবার অনুরোধ জানালেও তারা সামিল হয়নি। এই আন্দোলনে, আরএসএস এবং জনসংঘ আছে —এই অজুহাত দেখিয়ে সিপিএম ও সিপিআই তাতে যোগ দেয়নি। আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, যথার্থ অর্থেই এটি একটি গণআন্দোলন। এই আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে বিভিন্ন শক্তি তাদের রাজনৈতিক লাইন অনুযায়ী ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই সময়ে একটি যথার্থ বিপ্লবী পার্টির কর্তব্য হল, এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তার মধ্য দিয়ে আন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই পথে বিপ্লবী আন্দোলন শক্তিশালী হয়। কিন্তু সিপিএম ও সিপিআই লেনিনের এই শিক্ষা নিয়ে আন্দোলনে এল না এহং দুরে থাকল।

পরে সিপিএম-সিপিআই ও সহযোগী বামপন্থীরা যখন আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল, আমাদের দল এসইউসিআই(সি) তখন বলল, এই পশ্চিমবঙ্গ বামপন্থী আন্দোলনের ঘাঁটি। এখানে বামপন্থীরা নিজেরাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে। অন্য কারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু সিপিএম আমাদের এই বক্তব্যকে নস্যাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনকে আহ্বান জানায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। প্রফুল্ল সেন ছিলেন জনগণের চোখে অত্যন্ত ধিক্কৃত। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে তিনি গণআন্দোলনের উপর গুলি চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করেছিলেন। এইরকম একজন ব্যক্তি আন্দোলনের নেতা হিসাবে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই নিয়ে আমরা প্রকাশ্যে সিপিএমের সমালোচনা করি। আমরা চেয়েছিলাম, এ হেন একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মহান লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে প্রকাশ্যে সুস্থ তর্কবিতর্ক হোক এবং সত্য সামনে আসুক। কিন্তু আমাদের সমালোচনায় আপত্তি জানিয়ে সিপিএম বলেছিল, যুক্ত আন্দোলনে প্রকাশ্যে সমালোচনা চলবে না।

আটের পাতায় দেখুন

সোভিয়েত বিরোধী প্রচার ও স্ট্যালিন

তিনের পাতার পর

নিজের স্বাধীনতা সে রক্ষা করতে পারে। রাশিয়ানরা কখনও ইংল্যান্ডের ভূখণ্ডে আক্রমণ চালিয়েছে, ইতিহাসে এরকম একটি নজিরও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ইংরেজরা রাশিয়ার ভূখণ্ডে আক্রমণ চালিয়েছে ও ভূখণ্ড দখল করেছে এমন নজির ইতিহাসে ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে।

মিঃ মরিসন বলেছেন যে, রাশিয়ানরা জার্মান প্রশ্নে, ইউরোপের পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছে। এটি একটি ডাহা মিথ্যা এবং কত বড় মিথ্যা সেটা মিঃ মরিসনও জানেন। আসলে সত্য কী, সেটা সকলেই ভাল জানেন এবং তা হচ্ছে, এক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে রাশিয়ানরা অস্বীকার করেনি। আসলে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা আগেই জানত যে, রাশিয়ানরা কখনই জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান ঘটানোর পথে যাবে না, পশ্চিম জার্মানিকে আগ্রাসন চালাবার ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করার পথে যাবে না।

তবে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে সহযোগিতা করতে রাশিয়া কখনই অস্বীকার করেনি। উল্টে রাশিয়া নিজেই প্রস্তাব দিয়েছে যাতে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচি বাইরের হুকুমদারি ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুকুমদারি ছাড়া ইউরোপীয় দেশগুলির সমতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নীতির ভিত্তিতে কার্যকর করা হয়।

একই ভাবে মিঃ মরিসন অভিযোগ করেছেন যে, জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্টরা বলপ্রয়োগ করে ক্ষমতায় এসেছে। কমিনফর্ম জোর-জুলুম চালাচ্ছে ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারকর্মে লিপ্ত রয়েছে। এসব কোনও অভিযোগেরই কোনও ভিত্তি নেই। কমিউনিস্টদের কুৎসা না করে যারা জল স্পর্শ করে না, একমাত্র তারাই এসব কথা বলতে পারে।

ঘটনা হচ্ছে, জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্টরা সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এই দেশগুলির জনগণ শোষকদের ও বিদেশি গুপ্তচর বাহিনীর এজেন্টদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এটাই জনগণের ইচ্ছা। কমিনফর্ম প্রসঙ্গে বলা যায়, জোরজুলুম ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারকার্যে কমিনফর্ম লিপ্ত আছে, এ কথা একমাত্র তারাই বলতে পারে যারা পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। কমিনফর্ম-এর দলিলগুলি প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে এবং এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সকলেই সেগুলি জানেন এবং কমিউনিস্টদের সম্পর্কে যাবতীয় কুৎসামূলক ও অবমাননাকর বক্তব্যকে দলিলগুলি পুরোপুরি মিথ্যা প্রমাণ করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে খুব জোর দিয়েই আমরা বলতে চাই, বলপ্রয়োগ কমিউনিস্টদের কর্মপদ্ধতি নয়। বরং উল্টোটাই সত্য। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাস্তবে সাম্যবাদের শত্রুরা ও অন্যান্য বিদেশি গুপ্তচরবাহিনীর এজেন্টরাই জোরজুলুমের রাস্তা নেয়। তার দৃষ্টান্তের জন্য বেশি খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। অতি সম্প্রতি ইরানের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে, লেবাননের প্রধানমন্ত্রী ও ট্রান্স-জর্ডনের রাজাকেও হত্যা করা হয়েছে। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড এই দেশগুলির শাসন ক্ষমতায় জোর করে পরিবর্তন ঘটাবার একমাত্র মতলব থেকেই করানো হয়েছে। কারা এদের হত্যা করেছে? কমিউনিস্টরা বা কমিনফর্মের সমর্থকরা করেছে কি? এরকম একটি প্রশ্ন উত্থাপন করাটাই বরং মজার। মিঃ মরিসনই যেহেতু এ ব্যাপারে ভাল খোঁজখবর রাখেন, তাই সঠিক উত্তরটি পেতে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন।

মিঃ মরিসন বলেন, নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি হচ্ছে একটি আত্মরক্ষামূলক চুক্তি। আগ্রাসন চালাবার জন্য নয়, উল্টে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই এর লক্ষ্য।

এ কথাই যদি সত্য হয়, তবে এই চুক্তির উদগাতারা কেন সোভিয়েট ইউনিয়নকে এতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাননি? কেন তাঁরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ঘিরে সামরিক বেষ্টনী খাড়া করেছেন? কেন তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুপস্থিতিতে গোপনে এই চুক্তি সম্পাদন করলেন? হিটলার ও জাপানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন কি প্রমাণ দেয়নি যে, সে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়তে পারে এবং লড়তে চায়ও। এই চুক্তিতে যে নরওয়ে একজন স্বাক্ষরকারী— আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের লড়াই কি সেই নরওয়ের থেকেও খারাপ ছিল? এই উদ্ভট আচরণের কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

সোভিয়েট সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল, এই চুক্তিটি নিয়ে বিদেশ দপ্তরের মন্ত্রী পরিষদের সাথে আলোচনা করা হোক। নর্থ আটলান্টিক চুক্তিটি যদি ইংল্যান্ড-আমেরিকার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলকই হত, তবে সোভিয়েট সরকারের এই প্রস্তাবে তারা রাজি হল না কেন? তার কারণ কি এটাই নয় যে, এ চুক্তির মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানো সম্পর্কে অনুচ্ছেদ রয়েছে, যেটা চুক্তির উদগাতারা সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের কাছ থেকে গোপন করতে চান! রাজি না হওয়ার কারণ কি এটাই নয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণে সাহায্য করার জন্য ইংল্যান্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও বিমান ঘাঁটিরূপে পরিণত করতে লেবার সরকার সম্মতি দিয়েছে?

এ কারণেই সোভিয়েট জনগণ পুনরায় বলতে চায়, নর্থ আটলান্টিক চুক্তি হচ্ছে আগ্রাসন চালাবারই একটি জোট, যার টার্গেট হল সোভিয়েট ইউনিয়ন। এ ঘটনা বিশেষ করে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে কোরিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন দক্ষিণপন্থী চক্রের আগ্রাসী কার্যকলাপ থেকে। দু'বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেল ইঙ্গ-মার্কিন সেনারা কোরিয়ার স্বাধীনতাকামী, শান্তিপ্রিয় জনগণকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, গ্রাম-শহরকে ধ্বংস করছে, নারী-শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করছে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির এই হিংস্র কার্যকলাপকে কি কেউ আত্মরক্ষামূলক বলতে পারে? কেউ কি বলবে যে, ইংরেজ সেনাবাহিনী কোরিয়ায় গিয়ে কোরিয়ার জনগণের হাত থেকে ইংল্যান্ডকে রক্ষা করছে? ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর এইসব কার্যকলাপকে সামরিক আগ্রাসন বলাই কি অধিকতর সততার পরিচায়ক হবে না? মিঃ মরিসন পারেন তো এমন কী একজন সোভিয়েট সৈন্যকেও দেখান, যে শান্তিপ্রিয় জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। না, এমন একজন সোভিয়েট সৈন্যও নেই। এবং মিঃ মরিসন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিন যে, কেন ইংরেজ সৈন্যরা কোরিয়ার শান্তিপ্রিয় জনগণকে হত্যা করছে, কেন ইংরেজ সৈন্য স্বদেশ থেকে বহুদূরে এক অচেনা দেশে গিয়ে মারা যাচ্ছে? এ কারণেই সোভিয়েট জনগণ মনে করে, বর্তমান ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতি একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধে প্ররোচনা দিচ্ছে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

এআইডিএসও-র নেতৃত্বে হস্টেল আন্দোলনের জয়

কর্ণাটকের হনুমানথ নগরে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যালের এস সি, এস টি হস্টেলে দীর্ঘদিন ধরে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছিল। টয়লেট ছিল অপরিচ্ছন্ন, পাশের এক নির্মীয়মান বিল্ডিং-এর ধুলোয় বসবাস করাই দায় হয়ে উঠেছিল। হস্টেলে ছিল শয্যা সংখ্যার অভাব, সকলের জন্য চেয়ার টেবিলও ছিল না, ছিল বিদ্যুৎ সমস্যাও।

ছাত্ররা কর্তৃপক্ষকে বারবার জানালেও কোনও প্রতিকার হয়নি। আন্দোলন তীব্রতর করার লক্ষ্য নিয়ে ছাত্ররা এআইডিএসও-র সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারপর ঘোষিত হয় অনশন ধর্মঘট। আন্দোলন কিছুদূর এগোতেই শয্যা, টেবিল, চেয়ার আসতে শুরু করে। অন্যান্য দাবিগুলিও পূরণের লিখিত আশ্বাস দেওয়া হয়। তারপর ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। ছাত্রদের বক্তব্য এই আন্দোলন কর্ণাটকে হস্টেল আন্দোলনের মডেল হিসাবে কাজ করবে।

এআইইউটিইউসির রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

১ মার্চ মধ্যপ্রদেশের গুনা শহরে অনুষ্ঠিত হল শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির। বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র উদ্যোগে সারাদিনের এই শিক্ষাশিবিরে এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের 'শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে' পুস্তকটি পড়ে আসতে বলা হয়েছিল।

ভোপাল, গোয়ালিয়র, গুনা, অশোকনগর থেকে প্রতিনিধিরা শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শ্রমিকদের নানা প্রশ্ন এবং সেগুলি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে তা আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুনীল গোপাল এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর গুনা জেলা সম্পাদক কমরেড প্রদীপ আর বি।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রকাশিত এই পুস্তিকাটি প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দিন। বাস, ট্রেন, হাট, বাজার, স্টেশন সহ সর্বত্র বইটির ব্যাপক প্রচারের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করুন।

গণআন্দোলনের প্রয়োজনে বামঐক্য

সাতের পাতার পর

সেই থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনগুলিতে তারা আমাদের দলের সঙ্গে ঐক্য চায় না।

আজ এস ইউ সি আই (সি) বাম-গণতান্ত্রিক দলগুলির কাছে আহ্বান জানাচ্ছে, একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির শোষণ এবং কংগ্রেস ও বিজেপি উভয় দলের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার। এই সময় যে কোনও মূল্যে সংসদে কিছু আসন বাগিয়ে নেওয়ার জন্য বিজেপির ফ্যাসিবাদী নীতির হাত থেকে বাঁচার ধুয়ো তুলে সিপিএম-সিপিআই কংগ্রেসের সঙ্গে রফা করতে ব্যস্ত।

অথচ বিজেপির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তুলতে এবং বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলায় তাদের এতটুকু আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। নির্বাচনে সুবিধা পাওয়াই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ কথা বলে কমরেড রাধাকৃষ্ণ তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

নৌকা নিয়ে নদীপথ অবরোধ বিপন্ন মৎস্যজীবীদের

কৃষিকাজের অবস্থা ভাল নয়। কাজের আশায় মানুষ চলে যায় অন্য রাজ্যে-দেশে। যারা যায় না তারা নদী ও খাঁড়ি থেকে মাছ ও কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। সুন্দরবন সংলগ্ন বিশাল এলাকার এক বড় অংশের জীবনধারা এরকমই। এমন পরিবারের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দু'লাখ। সরকার চাইলে এখানে শিল্প গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু বছরের পর বছর তা হয়নি। মাছ ধরতে গিয়ে প্রায়শই বাঘ-কুমির-জলদস্যু-প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিতে প্রাণ চলে যায় দরিদ্র মানুষগুলোর। তবু দু'মুঠো অন্নের তাগিদে পুরুষানুক্রমে এই বিপদসংকুল কাজ করতেই হয় তাদের।

এই ভাবে একরকম চলছিল। ১৯৮২ সালে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার অজুহাতে সুন্দরবনের দ্বীপ ও জলে মৎস্যজীবীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার আইন জারি করে। ফলে, তারা জলের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ আমলেও একবার এহেন আইন জারির ষড়যন্ত্র হয়েছিল। সে সময়ে মৎস্যজীবী এবং রানী রাসমণির প্রতিবাদে তা সফল হয়নি। কিন্তু স্বাধীন দেশের সরকার বিকল্প কোনও কাজের ব্যবস্থা না করেই মৎস্যজীবীদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এই কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত বনদপ্তর মৎস্যজীবীদের বিএলসি পাশ (নৌকার লাইসেন্স), মেরিন লাইসেন্স, রেজিস্ট্রি লগ বই, জাল ইত্যাদি সহ মাছ ধরার সামগ্রী কেড়ে নিতে দৈহিক অত্যাচার করছে, যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়।

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৪ মার্চ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন নদীপথ অবরোধের কর্মসূচি নেয়। এতে বাসন্তীর হেড়োভাঙা নদী, গোসাবার দুর্গা দেওয়ানী নদী, কুলতলির চিতুড়ী ও পেটকুলচাঁদ নদী, রায়দীঘির মণি নদী ইত্যাদি জলপথের পরিবহন ব্যাপক প্রভাবিত হয়। একের পর এক নৌকার বেষ্টনীতে বড় বড় জাহাজ দীর্ঘক্ষণ আটকা পড়লে দেশ-বিদেশের পর্যটক সহ নানা সংবাদমাধ্যম দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আন্দোলনের খবর পায়। তাদের পক্ষ থেকেও আসে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন।

অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক, এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছি। সমস্ত জায়গায় চিঠিপত্র, স্মারকলিপি দিয়েছি। কিন্তু কোনও প্রতিকার হচ্ছে না। সুন্দরবনে মৎস্যজীবীরা ১০ হাজার যন্ত্রবিহীন এবং ৭ হাজার যন্ত্রচালিত নৌকা দিয়ে মাছ ধরে। এর মধ্যে ব্যাঘ্র প্রকল্প ৯৩২টি এবং রিজার্ভ ফরেস্ট ৪৪৪২টি মাত্র বিএলসি দিয়েছে। এই বিএলসি-র শতকরা ৪০ ভাগ পেয়েছে মৎস্যজীবী নয় এমন ব্যক্তিরা। বন দপ্তর ইতিমধ্যে ১৭০০ অ-মৎস্যজীবীদের বিএলসি বাতিল করেছে। কিন্তু এখনও প্রায় ১২ হাজার নৌকার বিএলসি হয়নি। এই কারণে তাদের জীবন বিপন্ন, অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটছে। ফলে, বিএলসি দেওয়া নিয়ে চলছে ব্যাপক দুর্নীতি ও দলবাজি। আমরা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অবিলম্বে বিএলসি দেওয়ার দাবি করছি।" 'মৎস্যজীবী-স্বার্থবিরোধী সমস্ত আইন দ্রুত বাতিল করা না হলে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠবে।

বিজেপি সরকার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের খড়্গ আরও ধারালো করছে

'বর্তমানে সংগঠিত ক্ষেত্রে স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। বাড়ছে ঠিকা শ্রমিক। এই সমস্ত ঠিকা শ্রমিকরা সীমাহীন বঞ্চনার শিকার। সমকাজে সমবেতন সহ সমস্ত প্রাপ্ত অধিকার থেকে এরা বঞ্চিত। এই সব নির্যাতিত অসহায় শ্রমিকের লড়াইয়ের পাশে না দাঁড়ালে নিয়মিত কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার কোনও নৈতিক অধিকার থাকে না'— ৮ মার্চ কলকাতায় সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে অল ইন্ডিয়া পাওয়ার মেন্স ফেডারেশনের ২য় রাজ্য সম্মেলনে এ কথা বলেন প্রধান বক্তা সংগঠনের সভাপতি তথা এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা।

এদিন রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সংবহন ও বণ্টনকোম্পানি এবং ডি ভি সিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের পাঁচটি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সম্মেলন ছিল। বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, শ্রম আইন সংশোধনের নামে লেবার কোড চালু করেছে বিজেপি সরকার। ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্টকে আইন সিদ্ধ করছে সরকার, যাতে শ্রমিকরা ইউনিয়ন গড়ে তুলে ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন করতে না পারে, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে। শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতার সমালোচনা করে তিনি মালিক শ্রেণির শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সমর সাহা। সভাপতিত্ব করেন কমরেড কৃষ্ণ মজুমদার। সম্মেলন থেকে কমরেড মানস সিনহাকে সভাপতি এবং কমরেড আনন্দ ঘোষকে সম্পাদক করে ২৫ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com